আমাদের ইতিহাস নেই অথবা এমনই ইতিহাস

বরেন্দু মন্ডল

আমাদের মাইগ্রেটেড মন সুন্দরবনের দ্বীপভূমিতে থিতু হয়নি সেভাবে। বৃহত্তর সুন্দরবনের থেকে দ্বীপবাসী মানুষদেরকে আমরা একটু আলাদা করে বুঝতে চাইছি। আর এ লেখার মধ্যে যেহেতু 'আমি পক্ষ'-এর উপস্থিতি-ই প্রবল, তাই বলা ভালো আমাদের সমস্যা সংকট গুলোকে একটু পৃথক করে বলতে চাইছি। সঞ্চারিত করে দিতে চাইছি ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে, প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে নয় কেবল-ব্যাপ্ত পরিসরে। লুপ্তপ্রায় গঙ্গারিডির ইতিহাস, আটঘরা সীতাকুণ্ডুর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের পাশাপাশি বহড়ু, জয়নগর মজিলপুরের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিচর্চা সুন্দরবনের যে প্রত্ন-ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা বলে সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষদের আলেখ্য, ইতিহাস তার থেকে অনেকটাই আলাদা। যদিও তার তুলনামূলক বিচার আজকের আলোচনার লক্ষ্য নয়। আমরা কথা বলবো আমাদের মাইগ্রেটেড মন আর তার ইতিহাস নিয়ে।

ছবি ঃ অজয় কোনার

সেদিন (১৬ আগস্ট, ২০১১) সকালে পরশমণি থেকে ফিরছি কলকাতায়, আমার কর্মস্থলে-ছুটি নেই আর, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে হবে তাই। পৌঁছাতে চাইছি দ্রুত। লাক্সবাগান বাজার থেকে ভ্যানো (মোটর চালিত ভ্যান-রিক্সা) করে যাচ্ছি জটিরামপুর। পথে সহযাত্রী শ্রী নিখিলচন্দ্র মন্ডলের সঙ্গে পরিচয় আলাপ থেকে পৌঁছালো বিস্তারে। বাড়ি হাড্ডায়। কয়রা থানা, জেলা খুলনা, বাংলাদেশ। নিজের ধান জমি ছাড়াও নদীর লাগোয়া বিল জমিতে আছে বাগদার নার্সারী। মীনকে কাঠি-বাগদা করে জলকরে বিক্রী করেন-জানালেন দুটো পয়সা চোখে দেখা যায় তাতে। এপারে এসেছেন-কেননা, যাবেন গয়ায়। দাদার সঙ্গে বাবার পিন্ডদানের জন্য। ঘুরে যেতে চান বৃন্দাবন। আবার কবে আসা হয়-তাই শান্তিগাছি, হীরন্ময়পুরের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছেন।

ন'দিন পরে সেদিন একটু রোদ উঠেছিল। এই কয়েক দিনের নিম্নচাপের বৃষ্টি নতুন সরকারকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেবার থেকেও দুর্যোগ মোকাবিলার মতো কঠিন পরীক্ষার সামনে ঠেলে দিয়েছে। কেবল সবজি চাষে ক্ষতির পরিমান চারশ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন কয়েকটি জেলা বন্যা পীড়িত। সুন্দরবনের দ্বীপভূমিতে আইলার বছরে ধান হয়নি এক মুঠোও। পরের বছরেও না। হতদরিদ্র চাষীদের আশা ছিল এবার ধান উঠবে গোলায়। নিম্নচাপের বৃষ্টি, বানের জলে সে আশাও গেল ভেসে। এবড়ো-খেবড়ো ইটের রাস্তায় ভ্যানো এগোয় গেরিলার মতো বিশ্বাসে। খানা খন্দে ভরা ইটের রাস্তার দুপাশে মাঠে থৈ থৈ জল। সহযাত্রী অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তার দেশের কথা পাড়েন। 'আমাগো দ্যাশে রাস্তায় পান্তাভাত ঢালে খাবা যাবে।' বললেন 'ইণ্ডিয়ায় সব ওইচে, তবে রাস্তা করতে ওইবো। কী আর ওইবে, আসলে এহ্যানে সোমাজ-ই তো নাই'। (বাংলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষও ভারতবর্ষ না বলে 'ইন্ডিয়া', বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে 'ভার্সিটি' বলতে বেশি পছন্দ করেন)। বেশ দৃঢ় গলায় বললেন 'বাংলাদ্যাশে এহ্যানো সোমাজ-ই আমাগো বাঁচায়ে রাখাতাচে।' আপনারা কোন সমাজে -জিজ্ঞাসা করায় ভদ্রলোক আমাকে অনেকবার দেখে ভ্যানো গাড়িতে যতটা দূরে বসা যায় ততোটা সরে গিয়ে বললেন 'কৃষ্ণ মতে'। পাল্টা যেই বলি তাহলে কর্তাভজাদের সঙ্গে আপনাদের তো অহি-নকুল? ভদ্রলোক মুখে কুলুপ আটেন। জানতে চাই পৌণ্ড্র-নমঃশুদ্রদের দ্বন্দ্বও কী একই রকম? অনেকক্ষণ পর ভদ্রলোক খুব স্পষ্ট করে কেটে কেটে বললেন- যাই ঘটুক না কেন ভোটের সময় পোদ-নমো, কর্তাভজা-কৃষ্ণ মতের সবাই ওই এক নৌকায়। সমাজের সবাই নৌকোয় ছাপ (নৌকা আওয়ামী লিগের প্রতীক চিহ্ন)।

খেয়া নৌকো পেরোই। আবার ভ্যানো আবার খেয়া নৌকো, চারটে নদীকে পিছনে রেখে ক্যানিং থেকে ট্রেন ধরে কখন যেন পৌঁছে গিয়েছিলাম কাজের জায়গায়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। কয়েকদিন ধরে গুছিয়ে ভাবতে পারছি না তেমন কিছু। তার ওপর বারবার হানা দিয়ে যাচ্ছে ওই মুখ। মানুষটা এতো জোর পেল কোথা থেকে? যতবার ভাবতে চাইছি প্রায় ততবারই আমার ভাবনাগুলো এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে- ওই অকপট উচ্চারণ।

থিতু হয়ে বসেছি আজ। সেই মুখের ইশারা আমাকে পথ দেখায়। উজান ঠেলতে হয় ইতিহাসের।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া পাকিস্তানের পূর্বভূখন্ডের মানুষেরা একুশে ফেব্রুয়ারির গণ-উত্থানে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্ব কতোটা ভ্রান্ত ছিল। ৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল ধর্মের মিল-ই মানুষকে মেলায় না, ভাষার ঐক্যই মানুষকে মেলায়। তারপর ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এই প্রথম বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা দিল। আগে মুসলমান পরে বাঙালি, নাকি আগে জাতীয়তা পরে ধর্মীয় পরিচিতি এ নিয়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনেক তর্ক হয়ে গেছে। উচ্চবর্গের হিন্দু-বাঙালি মুসলমান-বাঙালিকে কখনই বাঙালি হিসেবে স্বীকার করেনি। জাতীয়তাবাদী অভিমান থেকে তারা এখন বাংলাদেশী মুসলমান পরিচয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। '৪৭ এবং '৭১ এর পরেও যে সমস্ত হিন্দু বাঙালি অধুনা বাংলাদেশে মাটি কামড়ে পরে রইলেন তাদের লড়াইটা ভিন্নতর। কেননা স্বাধীন বাংলাদেশে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে মৌলবাদীদের দাপট বেশি। এসব কিছুর মধ্যে কোন সমাজ ব্যবস্থা বা সামাজিক পরিকাঠামো শ্রী নিখিলচন্দ্র মণ্ডলদেরকে 'বাংলাদ্যাশে এহ্যানো' 'বাঁচায়ে রাখতাচে'? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমবায় নীতি' বা 'পল্লিপ্রকৃতি'র প্রবন্ধে বারবার স্বদেশীসমাজ ও পল্লিআত্মশাসনের কথা বলেছেন। অর্থনীতিভাবনা ও পল্লি পুনর্গঠন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধিজির মত পার্থক্য থাকলেও আমরা গান্ধিজি-র গ্রাম স্বরাজ (Villege Republic)-এর প্রসঙ্গ এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে আনতে পারি। বস্তুত দুই মনীষা-ই রাষ্ট্রের থেকে গ্রাম সমাজকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন 'য়ুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে।... য়ুরোপের শক্তির ভান্ডারে স্টেট অর্থাৎ সরকার।... আমাদের দেশে কল্যাণ শক্তি সমাজের মধ্যে।' বাংলাদেশে ইন্টিগ্রেটেড বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে সংখ্যালঘু হয়েও নিখিল বাবুরা আজও টিকে আছেন। কৃষ্ণমতের সমাজ, অনুকূল ঠাকুরের মতের সমাজ, কর্তাভজা সমাজ, সতীমায়ের মতের সমাজ আপাত পৃথক হলেও রাজনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সময় থেকেই ইন্টিগ্রেটেড কালচার ইউনিট হিসেবে কাজ করেছে।

অন্যদিকে, '৪৭ এবং '৭১-এর আগে-পরে যে সমস্ত হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে সুন্দরবনের দ্বীপভূমিতে শিকড় খুঁজতে চেয়েছে, এখনও যারা বুকের মধ্যে একখন্ড জয় বাংলা বয়ে বেড়ান- দেশ হারিয়ে, সমাজচ্যুত হয়ে ইন্টিগ্রেটেড কালচার ইউনিট তৈরি

করার জোরটাই তারা হারিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন তাদেরকে বাধ্য করেছে আবার নতুন মাটি, আবার নতুন ভূমি, আবার নতুন সমাজের খোঁজ করতে। সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষ একত্রিত হয়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসব, বারোয়ারি হরিবাসর, মনসা পূজাকে ঘিরে মনসা মেলা ও মনসার ভাসান পালার পাঁচদিন ব্যাপী আয়োজন যে করেনি এমন নয়, এমন নয় যে তারা একত্রিত হয়ে একটি ক্লাব, লাইব্রেরী বা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন নি- কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যেও তার মাইগ্রেটেড মন আর ফেলে আসা ইতিহাস বারবার সামাজিক নিরাপত্তা খুঁজেছে। খুঁজে ফিরেছে ইন্টিগ্রেটেড কালচারাল ইউনিটের নিশ্চয়তা। না পেয়ে বদলে যাওয়া কলকাতার মেট্রোপলিটন মনের না-আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফেলেছে।

সুন্দরবনের দ্বীপভূমির জনসমাজের যে বিন্যাস, সে দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়-মূলত তিনটি পৃথক ভূখন্ডের মানুষ সুন্দরবনের দ্বীপভূমিতে এসেছেন নতুন ঠিকানার খোঁজে। নদী বাঁধের কাজের জন্য ছোটনাগপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এসেছেন মুণ্ডা, ওরাঁও , সাঁওতালরা। মূল সংস্কৃতির সূত্র থেকে চ্যুত এই আদিবাসীরা বসতি বিন্যাসের সময় দ্বীপভূমিতে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে গেলেন। মাইগ্রেশনের মধ্যে ঘটে গেল আবার মাইগ্রেশন। মেদিনীপুর থেকে সৎচাষী, বারুজীবি সম্প্রদায়ের যারা এসেছিলেন তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন সাগর, কুলপি, কাকদ্বীপ, নামখানা বা পাথরপ্রতিমার দিকে। আর সাতক্ষীরা, খুলনা, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, স্বরূপকাটীর দিক থেকে মূলত পৌন্ড্র ও নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষেরা এসেছিলেন তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন গোসাবা, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জের দিকে। এদের কারো ভাষায় বঙ্গালীর টান বেশি আবার কারও ভাষায় ঝাড়খন্ডীর। অর্থাৎ সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষ হিসেবে ভাষার মিল তাদেরকে মেলায়নি সেভাবে। বাঙাল আইডিন্টিটি মৈমনসিংহ, বরিশালের হিন্দু বাঙালিরা যেভাবে উপভোগ করেন-খুলনা, সাতক্ষীরা-র মানুষজন সেভাবে করেন না। ফলে দ্বীপভূমির মাইগ্রেটেড মন 'বাঙাল' পরিচয়েও সেভাবে মজে থাকেনি। লোক ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিগত সাযুজ্যের থেকে লৌকিক বিশ্বাস, আচার, সংস্কারে তারা অনেকটাই আলাদা। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা পার্থক্য ও লোকসংস্কৃতিগত পার্থক্য সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষদেরকে ইন্টিগ্রেটেড কালচার ইউনিটের মধ্যে আসতে দেয়নি। তবু গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছের টানে সুন্দরবনের দ্বীপভূমির মানুষ আবার থিতু হতে চেয়েছেন। ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সূচনা করতে চেয়েছেন নব-ইতিহাসের। যতবার থিতু হতে চেয়েছেন তারা, প্রায় ততবারই ভয়ংকর কোনো সুপার সাইক্লোন বা বন্যা তাদের বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের পর থেকে কৃষিকাজ বা মাছ ধরার পেশাগত অনিশ্চয়তা থেকে পরিবার ও নিজেকে বাঁচাতে দ্বীপভূমির মানুষ শহর অভিমুখী হয়েছেন। বিকল্প পেশা, সরকারি বা বেসরকারি চাকুরিতে যারা একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছেন তারা আর গ্রামে ফিরতে চাইলেন না। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলকাতা সন্নিহিত শহরতলিতে মানুষের সংখ্যা গেল বেড়ে। কলকাতার মেট্রোপলিটন মন তাদেরকে প্রায় গিলে খেয়ে নিল। এই সমস্ত মানুষদেরকে গ্রাম আজ আর মেনে নেয় না সহজভাবে- শহরেরও মেনে নিতে সন্নিগ্ধতা আছে। তাই মেট্রোপলিটন মনের সঙ্গে মাইগ্রেটেড মনের দ্বন্দ্বমূলকতা নতুন করে হল নির্মিত।

সুন্দরবনের দ্বীপভূমি থেকে যারা বেরিয়ে এলেন বা পৈতৃক ভিটা ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন তাদেরকে হয়তো এস্‌কেপিস্ট বলা যাবে না। কেননা এক ফসলী চাষ আর মাছ ধরার বাইরে সুন্দরবনের দ্বীপভূমিতে বিকল্প কোনো পেশা নেই। সরকারি ভাবেও তার কোনো চেষ্টা হয়নি। বাগদার মীন থাকবে না। কিন্তু উষ্ণায়নে জলস্তর যাবে বেড়ে। নুনের মাত্রা সহনশীলতাকে অতিক্রম করবে। চাই নোনা সহনশীল ধান বীজ বা পাটবীজ। বিকল্প চাষ সুন্দরবনের দ্বীপভূমির কৃষককে আবার স্বপ্ন দেখাতে পারে। বাজার অর্থনীতির সাপেক্ষে ক্ষুদ্রশিল্প বা কুটির শিল্পের কথা ভাবা যেতে পারে। ছোটো ছোটো ইউনিটের মধ্য দিয়ে জরির কাজ, শোলা শিল্প, মাদুর শিল্প, হস্তশিল্প, পাটজাত শিল্প, শুকনো মাছের প্রক্রিয়াকরণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত করা - এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ সুগম হতে পারতো। সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র ঠিক রেখে শিল্প চাই। তার আগে চাই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। রাস্তাতো শুধু পায়ে চলার পথ নয়- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি চাই আত্মনির্ভরশীলতা ও পল্লি আত্মশাসন। সচেতন গ্রাম সমাজ। সেই উদ্যোগের প্রথমে চাই বিশ্বাস। একজন ঝুমুর গাইয়ে, ছৌ শিল্পী বা আলকাপ দলে যে লোকটাকে প্রত্যেক দিন সঙ্ সাজতে হয় - দেখেছি তাঁরা তাদের শিল্পের প্রতি কতোটা দায়বদ্ধ, ইন্টিগ্রেটেড কালচার ইউনিটের প্রতি কি বিশ্বাসী। সেখানে মনসার ভাসান যাত্রার একজন গায়ক বা একজন টুসু শিল্পী নিজের পরিচয় দিতে খানিকটা কুণ্ঠিত। যেমন কুণ্ঠিত একজন অফিসবাবু- তার গ্রামের বাড়ি সুন্দরবনে এই সহজ সত্যটুকু স্বীকার করতে। স্বীকার করার সময় এসেছে এবার সুন্দরবনকেও সম পরিমানে ফিরিয়ে দেওয়ার দায় অস্বীকার করতে পারি না আমরা।

অনেক সময় পেরিয়ে গেছে আর দেরি নয়। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের কুটকচালি নয়-সরকারি, বেসরকারি সমস্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষকে লড়তে হবে বাঁচার লড়াই- যে লড়াইয়ে আমাদের মাইগ্রেটেড মন আবার ইতিহাস খুঁজে পাবে।

লেখক পরশমণি, গোসাবা-র বাসিন্দা। ছোট পত্রিকার প্রাবন্ধিক।